आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.________________

दिनांक/Date.________________

পঞ্চম বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

১৮ জুলাই ২০২০

২০১৮ সালের শেষের দিকে যখন আমি বিশ্বভারতীতে যোগ দিলাম, অনেকেই তখন আমাকে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির আশ্রমিক, প্রাক্তনী এবং ‘রাবীন্দ্রিক’-দের কাছ থেকে সহজাতভাবেই নাকি আমার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে! এই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা জেনে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। বিশেষ করে আশ্রমিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন সময়ে; বিশেষ করে পৌষমেলা ও বসন্তোৎসবের সময় আমি তাঁদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং তাঁদের সুপরামর্শ শুনেছি। তাঁদের কথাসূত্রে ভাল জানতে পেরেছিলাম— কীভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত সৃজনশীল সাংস্কৃতিক বীক্ষা থেকে সূচিত হয়ে বিশ্বভারতী একটি বিশ্বখ্যাত বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল; যা আমরা একজন ভারতীয় হিসেবে এতদিন বাইরে থেকেই শুধু জানতাম এবং উপলব্ধি করতাম। বিশ্বভারতীর কল্যাণে আন্তরিক শরিক হওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তনীরা অনেক মূল্যবান পরামর্শ ও সুচিন্তিত পথ-নির্দেশনা দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরতদের মধ্যে স্পষ্টতই প্রাক্তনীদের আধিক্য। অন্যভাবে বললে বিশ্বভারতীর অনেক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের গরিষ্ঠভাগ এই পর্যায়েই পড়বেন। যদিও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেশ উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আবার আশ্রমিক বা প্রাক্তনী নন, তাঁরা বাইরে থেকে এখানে এসেছেন; এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁদের মনে হতে থাকে তাঁরা যেন এখানে ‘বহিরাগত’, যেন কোনওদিনই এখানকার মহান ঐতিহ্যের শরিক হতে পারবেন না তাঁরা!

আশ্রমে ‘রাবীন্দ্রিক’-দের ঘনঘটা বিশেষভাবে নজর করার বিষয়! আমি আশ্রমে এমন কাউকে দেখিনি যিনি নিজেকে ‘রাবীন্দ্রিক’ বলে দাবি করেন না! প্রশ্ন হল কারা এই তথাকথিত ‘রাবীন্দ্রিক’? আশ্রমিকই হন, আর প্রাক্তনী কিংবা বহিরাগত;— সবাই নিজেকে ‘রাবীন্দ্রিক’ বলে দাবি করেন, যাতে মনে হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সমাজ-রাজনৈতিক রচনায় ও চিন্তাভাবনায় তাঁরা

আদর্শগতভাবেই দীক্ষিত! যাই হোক, অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম যে ‘রাবীন্দ্রিক’তার ওই নামাবলি গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার কারণ হল এমন অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যা রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনও অনুমোদন করতে পারতেন না। ‘রাবীন্দ্রিকতা’ এমন এক সার্বজনীন নামাবলি, বিশ্বভারতীর সুবাদে যার আড়ালে সবাই নিজেদের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিগত লাভালাভের পথ খুলে রাখেন; যেজন্য বিশ্বভারতীকে আমি আমার আগের বার্তালাপে বীরভূমের ‘একতম শিল্প’ বলে উল্লেখ করেছিলাম। এই প্রতিষ্ঠান হল এমন এক ‘শিল্প’ যে প্রতিনিয়ত একদলককে বেতন দিয়ে চলেছে আর একদল তার থেকে জীবিকার সংস্থান করে চলেছে; যা বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সম্ভবই হত না।

সত্যিকারের ‘রাবীন্দ্রিক’ হওয়া এমন মুখের কথা নয়! ‘রাবীন্দ্রিক’ বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁরা গুরুদেবের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। এটা খুবই শ্লাঘনীয় একটা মানবিকতার প্রশ্ন, কারণ রবীন্দ্রনাথ সত্যিই আমাদের শিখিয়েছিলেন যে মানুষ মানুষের জন্য। তাঁর চিন্তাধারায়, মানুষ হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা নিহিত থাকে অন্য মানুষের জন্য নিবেদিত হওয়ার মধ্যে। এই চিন্তাধারা অস্বাভাবিক নয়, যেহেতু তিনি এমন এক ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসা ব্যক্তিত্ব যখন নবজাগরণ ও জ্ঞানদীপ্তির মূল্যবোধ ছিল তুঙ্গে। সমবেদনা, সমূহযন্ত্র ও সমূহচিন্তার গুরুত্বের কথা গুরুদেব তাঁর সৃজনশীল রচনার মধ্যে বলে গিয়েছেন। এইজন্যই ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরা ব্রিটিশ-চাটুকার মাধব চাটুজ্যের আতিথ্য তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে সেই দরদি নাপিত দম্পতির ছোট কুটিরটাকে স্বস্তিকর মনে করেছিল যেখানে নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদে গ্রেপ্তার বরণ করা মুসলমান চাষি ফরু সর্দারের বালকপুত্র তমিজ প্রতিপালিত হচ্ছিল। ১৯০৪ সালে লেখা ‘স্বদেশী সমাজ’-এও তাঁর এই চিন্তাধারারই পরিচয় পাওয়া যাবে, যেখানে ভারতের গ্রামদেশের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু প্রয়োগমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি স্বীকার করতেন যে গোটা দেশের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অল্প কয়েকটি গ্রামের মানুষের সামাজিক ও আর্থিক দুর্দশা দূর করার চেষ্টা তিনি করতেই পারেন। বস্তুত একজন বাস্তববাদী মনের মানুষ হিসেবে কার্যকর কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়ে তিনি ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালীন সময় শান্তিনিকেতন-সন্নিহিত পঞ্চাশটি গ্রামে তাঁর কাজ শুরু করেন। আর্থিকভাবে গ্রামবাসীদের সাহায্য করার পরিবর্তে তিনি তাঁদের বিভিন্ন পেশাদারি কাজে দক্ষ করে তুলতে চাইলেন, যাতে তাঁরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন-ধারণ করতে পারেন। এই বৃত্তিমুখী কাজের প্রশিক্ষণ সেইসময় এত সফল হতে পেরেছিল তার কারণ সম্ভবত তখন বিশ্বভারতীতে এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন যাঁরা পয়সার জন্য নয়, আপন স্বার্থ ভুলে তাঁরা সর্বান্তকরণে দরিদ্র মানুষের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই যার সুফল পাওয়া গেছে। গ্রামবাসীরা বিশ্বভারতীর ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিকট-সংস্রবে এসেছেন। একইভাবে বিশ্বভারতীও তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিল। একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল সেদিন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যার মুখ্যস্থপতি। এই উদ্যোগ সফল করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনেক সহযোগী হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; এবং সবাই জানেন এই সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা দুবেলা অন্নসংস্থানের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বেতনটুকুও নিতেন না। এই দিক থেকে তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই স্বেচ্ছাসেবী, এবং তাঁরা আপোসহীনভাবে এই কাজ করে যেতে পারতেন কারণ জনসেবার রাবীন্দ্রিক-চেতনা অন্তরে গ্রহণ করে তাঁরা যথার্থতই হয়ে উঠেছিলেন ‘রাবীন্দ্রিক’। আমাদের অনেকের কাছে আজ এটা অলীক

কল্পকথা বলে মনে হতে পারে;— মনে হতে পারে কী করে এমন ব্যক্তিস্বার্থশূন্য কাজ করে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে? কিন্তু ইতিহাস বলছে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ; তাঁর আদর্শের প্রতি আস্থা এবং আশ্রমের জন্য মঙ্গল-ভাবনা থেকে সেকালের এই অনন্যসাধারণ প্রকৃত রাবীন্দ্রিকরা যে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন তার প্রভূত দৃষ্টান্ত আছে।

আমি মনে করি একজন ‘রাবীন্দ্রিক’ হলেন এমন এক আদর্শবর্গের অন্তর্গত মানুষ যাঁর মধ্যে আমরা কর্তব্য ও অকর্তব্যের একটা স্পষ্ট বোধ প্রত্যাশা করব। এমনকি গুরুদেবের লেখা খুব সাধারণভাবে পাঠ করলেও বোঝা যায় আমাদের জন্য কোন উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন।

১। ‘রাবীন্দ্রিক’ হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হল সমবেত প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের নিখিলেশ চরিত্রটির কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আসলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সবার মধ্যে সমষ্টির মঙ্গলবোধের চেতনা জাগিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ হল ‘আত্মশক্তির উদ্বোধন’। হেনরি মেইন তাঁর ১৮৭৪ সালে প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতা(যা পরে ‘প্রাচ্যের গ্রামসাধারণতন্ত্র’ নামে প্রকাশিত হয়)-য় বলেছিলেন প্রাচ্যের গ্রামগুলিতে এই অন্তরের শক্তি আছে যা দুঃখজনকভাবে পাশ্চাত্য দুনিয়া হারিয়ে ফেলেছে। এই ‘আত্মশক্তি’ বিশ্বভারতী থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে তা মনে হয় না, যদিও অতিক্ষুদ্র এক- আধটা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এখানে সক্রিয় আছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে বলব যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, এবং বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে কোভিড-১৯ পর্বে লকডাউনের দিনগুলিতে অসহায় গ্রামবাসীদের ত্রাণের কাজে হাত লাগিয়েছেন। মানুষের স্বেচ্ছাদান ও সহৃদয়তার উপর নির্ভর করে প্রায় তিনমাস এই ত্রাণের কাজ চলতে পেরেছে। আমরা যখন ক্যাম্পাস এবং তার আশপাশে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম নির্মূলীকরণের কর্মসূচি হাতে নিলাম, তখন সেও ছিল ‘আত্মশক্তির উদ্বোধন’-এর এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

২। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার কথা স্মরণে রাখলে ‘রাবীন্দ্রিক’ বলতে বুঝতে হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষের জন্য মমত্ববোধ। আরও অনেককিছুর মতো পৌষমেলা, মাঘমেলা প্রবর্তনের মধ্যে গুরুদেবের এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন মেলার মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের একটা সুযোগ পাবেন, এবং তাঁদের শিল্পকর্ম বিক্রি করে জীবিকা-অর্জনের সুযোগও লাভ করবেন। এই বাণিজ্যিক দিকটি ছাড়াও গুরুদেবের মনে হয়েছিল মেলার মাধ্যমে নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ মানুষেরা সুযোগ পাবেন একটা সমবেত আনন্দময় মুহূর্ত উদ্‌যাপন করার।

৩। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মেলা এমন একটা আবহ তৈরি করে যাতে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়, যা ধর্মীয় দিক থেকে স্বতন্ত্র দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এইটাই সম্ভবত সবচেয়ে উদ্ভাবনী ভাবনা যা ধর্মীয়, জাতপাত বা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভেদ ঘুচিয়ে সবাইকে ভ্রাতৃত্ববোধে একত্রিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল তেমন একটা মানসিকতা গড়ে তোলা যার ফলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তা ও তার অনুশীলনের প্রশ্নে মানুষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-নির্বিশেষে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে পারে। তাঁর এই চিন্তাগত অবস্থান সেইসময়ের মূলধারার কংগ্রেসি রাজনীতির বন্ধুবর্গের থেকে বিপরীত ছিল; কেননা সবাই জানেন, ১৯১৬ সালের লখনউচুক্তি, ১৯২০-২২ অসহযোগ

ও খিলাফতের মেলবন্ধন এবং ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের পরিকল্পিত বাংলাচুক্তি হিন্দু আর মুসলমানকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুটি বিজাতীয় সম্প্রদায়ে পরিণত করে। এটা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে হিন্দু আর মুসলমানদের সম্প্রদায়গত ভিন্নতার উপর এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি সেইসব মানুষকে বিভেদ-সৃজনে নিঃসন্দেহে আরও উদ্যমী করে তুলেছিল যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন থেকে লাভবান হত; এবং অংশত তারাই এই তত্ত্ব খাড়া করতে সচেষ্ট হল যে বিভাজনের মধ্য দিয়েই কেবল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভব! রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কিন্তু ছিল স্বতন্ত্র। একই মাটিতে জন্ম-নেওয়া, একই জল-হাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়া হিন্দু-মুসলমান কখনও, তাঁর দৃষ্টিতে, বরাবর 'ভিন্ন সম্প্রদায়' হয়ে ছিল না। এইজন্যই প্রয়োজন ছিল এমন মানসিকতা তৈরি করা যাতে ভাইবোনের মতো এই দুই সম্প্রদায়কে কাছে আনা যায়। পূর্ববঙ্গে তাঁর পূর্বতন শিলাইদহ জমিদারিতে এবং পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে তিনি সম্প্রদায়ভেদবুদ্ধি-বিরোধী অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এককথায়, গুরুদেব হলেন সম্ভবত সেইসব বিরল চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম যাঁর অনবদ্য সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার মধ্যে মুসলমান ভাইবোনেদের থেকে হিন্দুদের ভিন্নতাবোধের ভাবনা নিরসনের স্থায়ী প্রতিবিধান খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর এই চিন্তাধারা এইসময়ে খুব বেশি করে প্রয়োজন, যখন 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'— এই আপ্তবাক্য আমরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

৪। 'রাবীন্দ্রিক' বলতে আসলে আমরা কী বুঝব তা সজনীকান্ত দাসকে দেওয়া গুরুদেবের একটি সাক্ষাৎকার থেকে খুব সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সেখানে তিনি বলছেন, 'একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন---ঘর-ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি বলে ঘোষণা করেন।---এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে।' জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে গুরুদেব বলেছিলেন, 'আমার দেহ আজ অপটু, কিন্তু মন ছুটে চলেছে সেই পুরাতন কল্যাণের আদর্শ ধরে। ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্গে মিলে কাজে লেগে যাই।' এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলে, 'রাবীন্দ্রিক' বলতে আমাদের ঠিক কী বোঝা উচিত? তিনি বিশ্বাসী ছিলেন কঠোর পরিশ্রম-স্বীকারে, যাতে সমাজের একজন ব্যক্তিকেও তার আবশ্যক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে করুণ পরাভব স্বীকার করে নিতে না হয়। যার থেকে এই কথাটা দাঁড়ায় যে তাঁর চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে ছিল: আমরা পরের তরেই বাঁচব— এমন একটা আদর্শ। এটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যখন ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সময় পর্বের স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন যে ওইসময় গ্রামবাসীরা আগাছা পরিষ্কার করা, নিকাশিনালা-নির্মাণ; এবং এমনকি বল্লভপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন পর্যন্ত করেন! তাঁরা সবজি-বাগান তৈরি করেন। তাছাড়া সাঁওতাল মেয়েদের বয়নশিল্পের কাজেও প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। এইসব কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল আত্মনির্ভরতাশীলতার অভিমুখে সবাইকে সামিল করা। এইভাবে সমবেত আত্মনির্ভরশীলতার ধারণা মনের মর্মস্থলে গ্রহণ করে গুরুদেব বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষজনকে তার অন্তর্গত করে নিতে বিশেষ সচেষ্ট হতেন। শুধু হিন্দু নয়; মুসলমান, আদিবাসী-জনজাতি এবং অসংখ্য গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ এই লক্ষ্যে একত্রিত হতেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলে বুঝতে পারি, 'রাবীন্দ্রিক' বলতে যা বোঝায় তার থেকে গোষ্ঠীস্বার্থবুদ্ধি আমাদের দিগভ্রষ্ট করে! গুরুদেব সবসময় এইমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন: 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে

ধরি ধরি/ নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।' এইজন্যই আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে একজন ব্যক্তিমাত্র মনে করি না, মনে করি রবীন্দ্রনাথ একটি 'আদর্শ'; একটি 'আদর্শ স্বর'-এর নাম, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টা করে গেছেন। যেন-তেন-প্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য গুরুদেবের নাম নেওয়া কাম্য নয়। তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকার শুধু বাঙালিদের সম্পদ নয়, বরং তা সার্বজনীন মানবতার সম্পদ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট প্রয়োগকলার নাম; বা একটি বিশেষ কর্মাদর্শের নাম। সেইজন্যই আমার মনে হয়, আজকের দিনে তিনি আমাদের মধ্যে থাকলে এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের হালহকিকত দেখলে নিশ্চিতই আমাদের শ্লেষবিদ্ধ করতেন, যেমন তিনি করেছেন তাঁর 'চারিত্রপূজা' বইতে বা 'পরনিন্দা' নিবন্ধে।

গত কয়েকদশক ধরে বিশ্বভারতীর ধারাবাহিক অবনমনের কারণ অনুসন্ধান করে চলেছি আমি। আমার বার্তালাপগুলির লক্ষ্য হল নিরপেক্ষভাবে এইটা পর্যালোচনা করা যে কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন চলতে হয়! কিন্তু এখন আমাদের একটু নিজের অন্তরের দিকেও তাকাতে হবে; এবং নিঃসংকোচে স্বীকার করতে হবে যে এই ব্যাপক অবক্ষয়ের পিছনে আমাদের সবারই কোনও না কোনওভাবে ভূমিকা থেকে গেছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত একজন সহকারী অধ্যাপকের শূন্যপদের জায়গায় আইনবিরুদ্ধভাবে তিনজনকে নিয়োগপত্র দেওয়ার সময় আমাদের কারোর কিন্তু ভ্রুকুঞ্চন হয়নি! অডিট রিপোর্টের দৃষ্টিতে এসবই ধরা পড়েছে। নিয়ম ভেঙে চারটি বর্ধিত ভাতা(ইনক্রিমেন্ট) দেওয়া হয়েছিল বলে অডিট টিম বিশ্ববিদ্যালয়কে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। আরও তিনজন অধ্যাপকের সামনে (তাঁদের সম্ভবত স্মরণে থাকবে) উপাচার্যকে দলবেঁধে ঘিরে ধরে যখন তাঁর পরলোকগত পিতার নাম তুলে গালিগালাজ করা হয় তখন আমরা কিন্তু চুপ করেই ছিলাম! কেন গালিগালাজ? কারণ, বর্তমান প্রশাসন নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তাদের লাভজনক কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নিতে অসম্মত হয়। 'রাবীন্দ্রিকতা' মানে কি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে শুধু বাইরে থেকে 'আসি-যাই' করে কাল কাটিয়ে দেওয়া? এটাই কি 'রাবীন্দ্রিকতা'? বিশ্বভারতীর ঘুম ভাঙে 'গণদেবতা এক্সপ্রেস' এলে আর সে এলিয়ে পড়ে ১২-৪৫-এর 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস' গেলে বলে যে একটা চালুকথা আছে তা অতিশয়োক্তি হলেও তার খানিকটা সারবত্তা আছে বইকি! 'রাবীন্দ্রকতা' যেন একটা সুবিধাজনক মার্কা, যা আমাদের নিন্দুকেরা প্রায়ই সুবিধামতো গায়ে সেঁটে নেয় তাদের অপকর্মের অলংকরণ হিসেবে। ঠিক যেমন জাতীয় পরিবেশ আদালতের রায়কে মান্যতা দিতে চারদিনের বেশি পৌষমেলা চালাতে না দেওয়ায় বিশ্বভারতী প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল! আমাদের ক্যাম্পাস-ঐক্যের অভাব মর্মান্তিক! যখন আমাদের সহকর্মীদের কেউ কেউ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছেন(তাঁদের নিজেদের অপরাধের জন্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য!) তখন বিশ্বভারতীর তথাকথিত 'বাম' মনোভাবাপন্ন বন্ধুরা বিষয়টিতে উল্লাস প্রকাশ করছেন নিজেদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ চালাচালি করে (২১ জুন ২০২০)! বিশ্বভারতী কর্মসমিতি যদি 'বসন্ত তাণ্ডব' বন্ধ করতে বাধ্য হয় তাহলে তা প্রচণ্ড সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে যেহেতু তাতে বহুলোকের বৈধ-অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়!

আমরা 'রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য' নিয়ে কথা বলতে খুব ভালবাসি। কিন্তু দুয়েকটা নমুনা দিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে: আমাদের মধ্যে কতজন সেই 'ঐতিহ্য' বয়ে নিয়ে চলার জন্য বুধবারের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিই? কতজন প্রতিমাসের ক্যাম্পাস পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগাই?

ক্যাম্পাসময় ছড়িয়ে থাকা বিষাক্ত পার্থেনিয়াম আগাছা নির্মূল করার কাজে কতজন হাত লাগিয়েছেন? এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই ‘রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য’ কথাটা আওড়ান নিজের ভালমন্দের মানদণ্ডে; যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা বেঁচে আছি, যার সুবাদে আমাদের নামযশ— তার ভালমন্দের জন্য নয়! তাহলে ‘রাবীন্দ্রিক’ বলতে কী বুঝব? তার মানে কি তাহলে যার ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই তাকেও একটা চাকরি পাইয়ে দেওয়া? প্রশাসনের লোকজন বেআইনি পথে তৎক্ষণাৎ পদসৃষ্টি করে বিশেষ বিশেষ কাউকে কাজ পাইয়ে দেওয়াকেই কি বলব তবে ‘রাবীন্দ্রিকতা’? একজন প্রাক্তনী প্রকাশ্যে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করবেন অথচ বিশ্বভারতীর জনকল্যাণমূলক ত্রাণ-তহবিলে একটা সিকিপয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন না— এটাই কি ‘রাবীন্দ্রিকতা’? ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুল খুলে ভালরকম অর্থকামানোর পথ খুলে রাখা— এটাও কি ‘রাবীন্দ্রিকতা’? আমি নিশ্চিত, আপনারা আমার সঙ্গে সহমত হবেন যে এগুলি যথার্থ ‘রাবীন্দ্রিক’ আচরণ নয়; এবং এই গোষ্ঠীগুলির পরিকল্পিত রবীন্দ্র-বিরোধী আচরণ ও কাজকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার। তবে বিশ্বভারতীর অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের নিরুদ্যম হলে চলবে না।

আমি এই বার্তালাপ শেষ করব একান্তভাবে বিশ্বভারতীর কল্যাণের জন্য একটি নতুন মানসিকতা গড়ে তোলার আশা ব্যক্ত করে। আমরা সেই মহতী প্রতিষ্ঠানের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি যেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মানবতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস করেছিলেন। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য এখন এইসময়ে আমাদের নিজেদের ধন্য মনে করা উচিত; এবং কৃতজ্ঞতার বোধ থেকে আমাদের কাজের মধ্যে গুরুদেবের আদর্শ মনের গভীরে সঞ্চারিত করা উচিত।

বরাবরের মতো আমি আপনাদের আবারও অনুরোধ করি, এই কঠিন সময়ে আপনারা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে সবসময় সংযুক্ত হয়ে থাকুন।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ১৬/০৭/২০২০

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India